নারী জীবনের সমস্যা

গৌরী রায়

নারী জীবনে জটিলতা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নারীকে মানুষ হিসাবে না দেখে নারী হিসাবে দেখা, ভোগ্য পণ্য হিসাবে দেখা, এতো চিরকালই আছে; কিন্তু সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী জীবনের সমস্যাগুলোও পরিবর্তিত হচ্ছে। নারীজীবনের বর্তমান সমস্যা নিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই প্রতিবেদন।

১। শৌচালয় ঃ

মেয়েরা বিভিন্ন বয়েসে বিভিন্ন ব্যাপারে বিব্রত, বিধ্বস্ত। যে ব্যাপারটি নিয়ে থানায় অভিযোগ জানানো যায় না অথচ খুবই অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে, সেই শৌচালয় নিয়েই আলোচনা শুরু করি। এখনও বহু রেলওয়ে ষ্টেশনে মেয়েদের শৌচালয় নেই। আবার কোথাও থাকলেও ব্যবহারযোগ্যও নয়। বাসপথে কোন স্টপে তো শৌচালয় নেই, আবার বেশিরভাগ শহরের বাসস্ট্যান্ডের শৌচালয় ব্যবহারযোগ্য নয়। অনেকটা পথ যেতে হলে মেয়েরা তাহলে কী করবে? নিরূপায় হলেও খোলা জায়গায় বসে পড়া সম্ভব নয়, অন্ততঃ শহরের মেয়েদের পক্ষে। বছর আটেক আগে আমি একদিন ডানকুনি স্টেশনে নেমে পড়তে বাধ্য হই বাথরুমে যাওয়ার জন্য। তখন রাত্রি পৌনে আটটা, দেখলাম স্টেশনে কোন বাথরুম নেই। তাই বাধ্য হয়ে টিকিট কাউন্টার থেকে একটু দূরে বসে পড়লাম। কাছ দিয়ে দুজন বয়স্ক লোক যাচ্ছিলেন, তারা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন আমি না উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত। যেসব মেয়েরা স্কুলে পড়ে তাদের অবস্থাও ভয়ানক। শিক্ষার অধিকার আইনের সমীক্ষায় জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ শতাংশ স্কুলে পানীয় জল নেই এবং ৬০ শতাংশ স্কুলে মেয়েদের শৌচালয় নেই। বেশিরভাগ স্কুলেই মেয়েদের কোন চেঞ্জ রুম নেই যেখানে ঋতুকালীন অবস্থায় মেয়েরা চেঞ্জ করতে পারে। এইভাবে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও 'ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন' হয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। যদি বা কেউ ডাক্তার দেখালো, ওষুধ কেনার টাকা নেই। আবার কেউ কষ্ট পাচ্ছে, অথচ লজ্জায় মাকেই বলতে পারছে না। ২০০৯ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্র হাইস্কুলের অষ্টমশ্রেণির এক ছাত্রী এভাবেই ইনফেকশন হয়ে মারা যায়। পরে অবশ্য হেডমাস্টারের উদ্যোগে ও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সহযোগিতায় সেখানে সুবন্দোবস্ত হয়। শুধু মেয়েদের শৌচালয় নিয়েই দেশ জুড়ে একটা আন্দোলন হতে পারে, কিন্তু বিশেষ ফল হবে না কিছু মহিলা কোথাও কোথাও একজোট হলে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল এসে জুটে যাবে নিজেদের স্বার্থে কিংবা পথ অবরোধ, রেল অবরোধ বা পুরুষদের টয়লেটে যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ করলে আন্দোলনকারীদের কঠিন হাতেই দমন করা হবে। তাই মনে হয় প্রথামাফিক আন্দোলনে না গিয়ে আমরা মেয়েরা, বিশেষ করে কয়েক লক্ষ স্কুলছাত্রী যদি গণসাক্ষর সংগ্রহ করে দেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে প্রত্যেক স্কুলে, স্টেশনে ও বাসরাস্তায় কুড়ি কিলোমিটার অন্তর শৌচালয় করার আবেদন জানায় তাহলে হয়তো বা কিছু সুফল মিলতেও পারে।

২। কিশোরীদের সমস্যা ঃ

দেহে মনে যখন পরিবর্তন হচ্ছে, তখন পরিবর্তিত অবস্থায় কোথায় কিভাবে চলবে, তার ঠিক 'গাইড লাইন' পাচ্ছে না বেশিরভাগ মায়েদের কাছ থেকে। তার প্রধান কারণ, মায়েরাও বেশিরভাগই বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তেমন ওয়াকিবহাল নন। এবং একটা দূরত্ব থাকার জন্য সব সমস্যার কথা মাকে বলতে পারছে না। মোবাইল ফোন, ফেসবুক থেকে নানান সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অচেনা নম্বরে যোগাযোগ হয়ে কারোর গোপনে বিয়ে হচ্ছে। কারোর আবার ফেসবুকে বন্ধুত্ব হয়ে আনন্দেই দিন কাটছিল কিন্তু যখনই জানাচ্ছে, মিশবে কিন্তু বিয়ে করবে না, তখন একেবারেই ভেঙে পড়ছে। বেশিরভাগ মেয়েদের এই এক রোগ, কাউকে তেমন ভালোবেসে ফেললেই বিয়ে করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কিন্তু ছেলেদের সাধারণতঃ ওসব বালাই নেই। ভাবটা এরকম, বিয়ে করার কি আছে, পরে যদি আরও ভালো পাই। যেসব মেয়েরা হষ্টেলে বা মেসে থাকে, দীর্ঘসময় মোবাইলে কথা বলে দেহ মনের ক্ষতি হচ্ছে, পড়ায় মনোযোগ হারাচ্ছে, কিছু চিন্তা করারও অবসর পাচ্ছে না, যেটা শিক্ষা জীবনে ভীষণ দরকার। দরিদ্র পরিবারে স্কুলে পড়তে পড়তে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাবা মা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। তাই শরীর মন দুইয়েরই ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মও। পশ্চিমবঙ্গে দুটি বিয়ের মধ্যে একটি নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে।

যারা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে তাদের একাদশ শ্রেণিতে উঠে কিছু সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ গার্লস স্কুলেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ছেলেমেয়ে এক স্কুলে পড়তে হয়। তখন অনেকেরই পড়ায় মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে দুই দলেরই। টিউটরের কাছেও একই সমস্যা। যারা খুব জনপ্রিয় টিউটর, অনেক ছাত্রছাত্রী পড়ান তারাও একবেলা ছেলে, একবেলা মেয়ে, এভাবে পড়ান না। সেখানে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। ফলে লেখাপড়া যাদের ভালো লাগে না তারাও পড়তে যাওয়াটা 'মিস' করে না। পড়ায় মনোযোগ হারাচ্ছে, অনেক মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তবুও মাকে বলা যাচ্ছে না। কেউ কেউ পরিবারের মধ্যে বা নিকট আত্মীয় দ্বারা যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছে।যেসব মেয়েরা হস্টেল বা মেসে থেকে স্কুল-কলেজে পড়ছে, তাদের মধ্যে সমকামিতার মনোভাব তৈরি হচ্ছে, তারা একে অপরকে বিয়ে করতে চায়, একসাথে থাকতে চায়, বাড়ির দিক থেকে সম্মতি না থাকায় অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে, কাউকে হস্টেল থেকে তাড়িয় দিচ্ছে, কেউ কেউ একসাথে আত্মহত্যাও করছে।

৩। যাতায়াতের সমস্যা ঃ
রাজ্যে বেশীরভাগ লোকাল ও এক্সপ্রেস বাসে লেডিজ সিট নেই। যাদের নিত্য অনেকটা পথ যাতায়াত করতে হয় তাদের সমস্যা হয়। লেডিজ কম্পার্টমেন্টেও পুরুষরা বহু জায়গাতেই অনায়াসে যাতায়াত করছেন। সমস্ত লেডিজ কম্পার্টমেন্টে পুরুষ হকাররা নিয়মিত ওঠেন খুব ভীড় থাকলেও, কিন্তু সব হকার ভদ্র নয়। যেমন বাসের সব যাত্রী ও সব কনডাক্টর ভদ্র নয়। কিন্তু প্রতিবাদ করলে কোনও ফল হয় না বরং কিছু বাজে কথা শুনতে হয়। এই ব্যাপারে রাজ্যপ্রশাসনও রেল উদ্যোগী হলে মহিলা নিত্য যাত্রীদের কিছু অসুবিধা কমতে পারে।

৪। নারীর নিরাপত্তাহীনতা ঃ
আমরা মেয়েরা এই মুহূর্ত্তে প্রচন্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি, আমরা আতঙ্কিত হচ্ছি। কোন্ পুরুষ বা কোন্ পুরুষেরা কোন্ মহিলার উপরে কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে, অত্যাচার করবে, করে খুন করে দেবে, কিছু ঠিক নেই। যে মেয়েটি স্কুলে গেল বা একটু দূরে টিউটরের বাড়ী পড়তে গেল সে আর কোনদিন বাড়ী ফিরবে কিনা কোনই নিশ্চয়তা নেই। অল্প সংখ্যক মেয়েরা যাঁরা আকর্ষণীয় পোষাক পরছেন, কিংবা সিনেমায় অভিনয়ের ছলে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার ছলে, বিউটি কনটেস্টের ছলে বা 'ব্লু ফিল্ম' করার অজুহাতে যে ভাবে নিজেদেরকে অনাবৃত করছেন, যাকে মিডিয়া 'সাহসী পোষাক', 'সাহসী অভিনয়' বলে উৎসাহিত করছেন, তার ফলে কিছু পুরুষ সুস্থ চিন্তা-ভাবনা হারিয়ে ফেলছেন। আমরা নারীরা তাঁদেরকে প্রলুব্ধ করছি, প্ররোচিত করছি, আমরা আমাদের অশ্লীল ছবি দেখিয়ে আমরাই আমাদের বিপদ ডেকে আনছি। ফলে কিছু মেয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, কেউ বা খুন হয়ে যাচ্ছেন, কিছু পুরুষ দুষ্কৃতি বলে সমাজে ধিকৃত হচ্ছেন, কেউ শাস্তি পাচ্ছেন, ফলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আর যদি কোন মেয়ে বেঁচে গেল তবে তবে পুলিশের কাছে বা কোর্টে যেভাবে ঘটনার বিবরণ দিতে হচ্ছে, সে অপমানও কিছু কম নয়। মেয়েদের পোষাক নিয়ে কেউ সমালোচনা করলেই সঙ্গে সঙ্গে মহিলা কমিশন থেকে শুরু করে প্রগতিশীল নারী সংগঠন, সমাজের বিশিষ্ট নাগরিক থেকে সাধারণ ঘরের আধুনিক মহিলা পর্যন্ত তারস্বরে প্রতিবাদ করছেন বলছেন এটা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে । কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা মানে তো যা খুশি করার স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা এক কথা নয়। রাষ্ট্রের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক কোন কাজ বা ভাবনা নিশ্চয়ই ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে খুবই উগ্র সাজপোষাক পরা খুব সুন্দরী মহিলারা কিন্তু বিশেষ আক্রান্ত হচ্ছেন না, আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মহিলারাই। কয়েকজনের জন্য বহু মেয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, প্রাণ হানি হচ্ছে, যেমন শিয়ালদা স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে আট দশ জন হকারের জন্য প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ অসুবিধা ভোগ করছেন। কিংবা শেওড়াফুলি বাজার থেকে স্টেশনে ঢুকতে রাস্তার মাঝখানে বসা আট দশজন দোকানদারের জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার বিশেষ করে চৈত্র ও শ্রাবণ মাসে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর অসুবিধা হচ্ছে। সংবাদপত্রে, টিভিতে, রাস্তায় অশ্লীল বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্য খুব দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

প্রতিদিন আমরা বিব্রত হচ্ছি, বিধ্বস্ত হচ্ছি। যত দেখছি, শুনছি, ততই ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠছি, ভাবছি আরও কি দেখতে হবে! তবে এটাও ঠিক, যে সব পুরুষেরা এইসব হীন কাজ, অন্যায় কাজ করছেন তাঁরা বেশিরভাগই বেঁচে থাকার মত সুন্দর পরিবেশ পাননি। শিক্ষা নেই, পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, থাকার সুস্থ পরিবেশ নেই, বাবা-মায়ের স্নেহ নেই, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেদের অবহেলার দৃষ্টি, কম বয়েসে নেশাগ্রস্থ হয়ে পরা, আয়ের তেমন সুবন্দোবস্থ না হওয়া...এই সব মিলিয়ে যে সব ছেলেরা পুরুষ হয়ে উঠছেন, তাঁরা কেউ কেউ জীবনটাকে ঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না;শুধু নারীর প্রতি আকর্ষণই নয়, পুরো সমাজটার প্রতি একটা আক্রোশ, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা। তাই কেউ কেউ কোন নারীকে অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে খুন করছেন। এর জন্য দায়ী কি শুধু ওই ধর্ষক? ওই খুনী ধর্ষক? তাঁর পরিবার, তথা সমাজ তথা রাষ্ট্র কি অনেক বেশি দায়ী নয়? কিন্তু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেই আমরা অনেকেই অত্যাচারীর ফাঁসি চাইছি। কিন্তু তাঁর পরিবার, আমরা অর্থাৎ সমাজ,এবং রাষ্ট্রযন্ত্রেরও কি কোন শাস্তি হওয়া উচিৎ নয়? শুধু 'এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা' বা 'এই নারকীয় ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি' বা 'এই ধর্ষক খুনির ফাঁসি চাই' বলেই রাষ্ট্র তার দায়িত্ব শেষ করতে পারে না।আজ যারা শিশু, পনেরো কুড়ি বছর পরে তাদের মধ্যে কেউ যাতে ধর্ষকের ভূমিকায় না আসে সে ব্যবস্থা তো রাষ্ট্রের করা দরকার; পরিবার ও সমাজের আরও দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন, এ কথাটি ভুললে চলবে না।

দোষ একার নয় জানি তবু বলছি, যে নারীর মাধ্যমে পুরুষের জন্ম, যে নারীর স্নেহ-যত্নে পুরুষের 'পুরুষ' হয়ে ওঠা, সেই নারীর প্রতি এমন অমানবিক আচরণ কি ঠিক হচ্ছে পুরুষ সমাজকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই! বাংলা, হিন্দি ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার চিত্র পরিচালকদেরও ভেবে দেখা ভীষণ দরকার, তাঁরা আর্টের ছলে, সিনেমার প্রয়োজনে যে সব দৃশ্য দেখাচ্ছেন, যে সব বিষয়কে উপস্থাপিত করছেন, তাতে সার্বিকভাবে সমাজ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে! কারণ, আর্টের কাছে সমাজের তো একটা দাবি থাকে।

৫। নারী নির্যাতন ঃ
বর্তমান পুরুষ সমাজ যেভাবে কন্যা শিশু, কিশোরী, যুবতী এমনকি প্রৌঢ়া নারীর উপর অত্যাচার করছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুন করে দিচ্ছেন, মিডিয়া সে খবরগুলো লুফে নিচ্ছে এবং বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করছে। তাতে দর্শক ও পাঠক সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু

বিকৃত রুচির মানুষেরা এতে উৎসাহিত হচ্ছেন খারাপ কাজে। 'পুলিশ ধরে ফেলবে ঠিক' এই ভেবে একটুও ভয় পাচ্ছেন না, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাই প্রমাণ করে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ধর্ষণে দু'নম্বরে, নারী নির্যাতনে শীর্ষে। নথিভুক্ত ধর্ষণ : ২৩৬৩ নারী নির্যাতন : ২৯১৩৩। পরিসংখ্যান বলছে প্রতিবছর এদেশে ৫০০০০ শিশু অপহৃত হয়। দেহ ব্যবসার জন্য মেয়ে বিক্রির ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে।

৬। পতিতালয়, হোম ও সংশোধনাগারে অবস্থিত নারীদের সমস্যা ঃ
পতিতালয়ে যাঁরা থাকছেন নিরুপায় হয়ে কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের তো যন্ত্রণার শেষ নেই, যাঁরা সরকারী হোমে বিভিন্ন কারণে আশ্রয় নিয়েছেন, বা যে সব মেয়েরা সংশোধনাগারে বিচারাধীন হিসাবে বা সাজা প্রাপ্ত হিসাবে বন্দী আছেন, তাঁরাও নানা ভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন ।

৭। বিবাহিতা মহিলার সমস্যা ঃ
যে বধুর শ্বশুরবাড়ী মুসলিম পরিবারে তার স্বামী তিনবার তালাক বললেই তো সংসার জীবনের অবসান। আর যাঁর শ্বশুরবাড়ী হিন্দুর ঘরে, তাঁর অবস্থাও এর থেকে ভালো কিছু নয়। অনেক টাকা পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মর্জি মাফিক বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে না পারলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারতে পারে কিংবা শ্বাসরোধ করে মেরে ফ্যানে ঝুলিয়ে দিয়ে মেয়ের বাবাকে খবর দিতে পারে আপনার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কোথাও স্বামীর অত্যাচার কোথাও শ্বশুরের অশ্লীল আচরণে অসহ্য হয়ে সত্যি সত্যিই আত্মহত্যা করছেবহু নারী প্রতিদিন। পণপ্রথার বলি প্রতি ঘন্টায় একটি। পারিবারিক অত্যাচারের কারণে আত্মহত্যা করছে ৫৯ জন গৃহবধু। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন স্বামী শহরে কোন কাজ পেলে ওখানে আবার একটা বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাচ্ছেন । বাড়ির সাথে সম্পর্ক না রাখায় শ্বশুরবাড়ির লোক বধূকে থাকতে দিচ্ছেন না, বাপের বাড়ীতেও সহজে রাখতে চান না। কারোর পঁচিশ বছর বয়েস এর মধ্যেই হয়ত তিনটি সন্তান হয়ে গেছে। আয় করবার মত যোগ্যতা নেই, এক ঝিয়ের কাজ বা বিড়ি বাঁধা ছাড়া। নিজেরই বাড়িতে অবাঞ্ছিতের মত দুঃসহ জীবন যাপন করা।

আমরা মেয়েরা কোথাও কি একটু নিরাপদ আশ্রয় পাবো না! নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবো না! যেমন পুরুষদের থাকে অথচ আমরাইতো সংসারের যাবতীয় সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করি, সবাইকে ভাল রাখার চেষ্টা করি, ছাতা হয়ে থাকি সংসারে! যদিও ঘরের কাজকে আজও সমাজ কাজের মধ্যে ধরে না, যদি কোন স্ত্রী চাকরী না করে তার স্বামী বন্ধুকে বলেন,''আমার মিসেস কিছু করে না, বাড়িতে থাকে।'' আর যে সব বিবাহিতা নারীদের সতীনের সাথে ঘর করতে হয়, তাঁদের জীবনটাও বড় যন্ত্রণাদায়ক। বাংলার কিছু কিছু সমাজে আইন সিদ্ধ না হলেও প্রথা সিদ্ধ যে, কোন পুরুষ চাইলে দুটি বিয়েও করতে পারেন এবং অনেকেই করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী এলেই সংসারে প্রথম জনের অধিকার কমে যায়, প্রথমা স্ত্রীর প্রতি টান কমে যায় স্বামীর। তাঁরই সামনে অন্যজনের আধিপত্য বাড়ে সবদিক দিয়েই। মুসলিম সমাজে একাধিক বিয়ে স্বচ্ছন্দে করা যায় এবং সেটা ধর্মের দিক দিয়ে কোন অন্যায় নয়, ফলে অনেকেই একাধিক বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর বয়স হয়ত চল্লিশ, দ্বিতীয় স্ত্রীর সতেরো। 'চল্লিশ'কে যদি 'সতেরো'র সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় সে মানসিক পীড়ন বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। নিজের সংসারেই নিজে অবাঞ্ছিত। কিন্তু তা বলে নিজের বাড়ি, নিজের সংসার ছেড়ে তো চলে যাওয়া যায় না। আর যাবেই বা কোথায়!

কিছু বিবাহিতা মহিলা বিশেষত চাকুরিজীবি মহিলারা সমাজের কিছু বিবাহিতা মহিলার সমস্যার সৃষ্টি করছেন, নিছক ব্যক্তিগত সুখের জন্য বা উশৃঙ্খল জীবন যাপনের আনন্দ উপভোগের জন্য। কোন বিবাহিতা মহিলার কর্মস্থলের কোন পুরুষকে ভাল লাগল, অমনি তাঁর নিজের স্বামী,-সন্তান যা নিয়ে এতদিন অনেক স্বপ্ন ছিল, মুহূর্তে তাঁরা ঐ মহিলার জীবনে গুরুত্ব হারালেন। তিনি স্বামীর সাথে ডিভোর্স করে আপন সন্তানকে ত্যাগ করে অন্যের স্বামীকে বিয়ে করছেন। ফলে যে পুরুষকে বিয়ে করলেন তাঁর স্ত্রীর আর সন্তানের জীবন বিড়ম্বিত হল। তাঁর স্ত্রী যদি আয় না করেন তবে তাঁর স্ত্রী সন্তান পথে বসলেন। যাঁর স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন সেই সব স্ত্রীরাও কেউ কেউ বেশ 'প্রগতিশীল'। সন্তানকে ঠাকুমা দিদিমার কাছে সঁপে দিয়ে নতুন স্বামী জুটিয়ে নতুন জীবনের দিকে পা বাড়ালেন। ফলে দুটি পরিবারের সন্তানেরা কার্যতঃ অনাথ হয়ে পড়ল। তাই আমার সেই সব দিদিদের কাছে অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন তাঁদের আত্মজদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হন। আর যেসব কর্মরতা অবিবাহিতা মহিলা নিজের আবেগকে সম্মান দিতে কোন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করে আর এক মহিলার সংসার ভাঙছেন তাঁদেরকেও অনুরোধ জানাই তাঁরাও তো দুদিন পরে মা হবেন, অন্যের সন্তানের প্রতিও তাঁদের যেন একটু মমতা থাকে।

শিক্ষিতা উপার্জনকারী নারীদের মধ্যে বিয়ে না করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যদি বিয়ে না করে কোন ভাল কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান , সেটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু কেউ কেউ স্বাধীনভাবে থাকবে, ভালো খাবে,ভালো পরবে, মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবে এখানে ওখানে, শুধু একারণেই বিয়ে করতে চাইছেন না। কেউ কেউ একা একা ফ্ল্যাটে থাকছেন স্বাধীন ভাবে থাকার আনন্দে। এই একা থাকায় কিছু সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ কেউ বিয়ে করছেন না অথচ 'লিভ টুগেদার' করছেন। এতেও সমস্যা

হচ্ছে জীবনে কোন বন্ধন নেই, তাই জীবনে কোন স্থিতিশীলতা আসছে না। আর একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিশেষ করে যেসব মেয়েরা হস্টেল বা মেসে থেকে চাকরি করছেন, তাদের মধ্যে সমকামিতার মনোভাব তৈরি হচ্ছে। তাতে সমাজে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।কিছু বিবাহিতা মহিলা বিশেষ করে কিছু শিক্ষিতা, আর্থিকভাবে সচ্ছল বিবাহিতা মহিলা নিজেদের লোভ এবং হীন মানসিকতার জন্য তাঁদের স্বামীদেরকে হয়রান করছেন ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহার করে। ফলে স্বামীর জীবন তো বিড়ম্বিত হচ্ছেই নিজের জীবনটাও বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে, সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে।যদিও সমস্যাটা নারী নিজেই সৃষ্টি করছেন তবু এটাও নারীর একটা সমস্যা।

৮। শিশুকন্যা ও নারী পাচার ঃ
মহিলা কমিশনের সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী প্রতিবছর ইউরোপ আমেরিকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা পর্যটকদের শতকরা ২৫ ভাগ যৌন নিবৃত্তির জন্য ১৩-১৬ বছরের কিশোর-কিশোরীদের এ দেশে খুঁজে বেড়ান, মূলতঃ এই কারণে এ রাজ্য থেকে প্রতি বছরেই প্রায় কুড়ি হাজার মহিলা ও শিশু পাচার হয়ে যায়। এদেশের প্রায় এক হাজারের মত পতিতা পল্লীতে ২৩ লক্ষ গণিকার মধ্যে ২৫ শতাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক। শুধু পতিতা পল্লীতেই বিক্রির জন্য নয়, অর্থ রোজগারের অনেক রকম অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়েই চলছে নারী ও শিশু পাচার। এরা পাচার হচ্ছে দেশগুলিতে ভিক্ষাবৃত্তির জন্য। যাঁরা কিনে নিচ্ছেন, তাঁরা তাদেরকে বিকলাঙ্গ করে তাদেরকে দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে আয় করছেন। ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। যারা পাচার করছে তাদের আয় বছরে পায় ৭০০ কোটি ডলার। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেশিরভাগ পাচারকারীদের কোন শাস্তি হচ্ছে না। যেসব বাবা মা জেনে বুঝে কাজে পাঠাচ্ছেন তাঁদেরও কোন শাস্তি হচ্ছে না। শিশু কন্যা ও কিশোরীরা কারোর বাড়ীতে কাজ করতে গিয়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, কেউ বা পতিতাপল্লীতে। অভিযোগ জানানোর কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা মেয়েরা চিরকাল শুধু দেখব? এছাড়া কি আমাদের আর কিছুই করার নেই!

৯। সন্তানহীনা নারীর সমস্যা ঃ
নারীর জীবনের পূর্ণতা তার মাতৃত্বে যে বধূর সন্তান হল না নিজের বা স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার জন্য তার জীবন সতিই দুঃখজনক। তার থেকেও যন্ত্রণাদায়ক যে নারীর সন্তান হল না তাকে এর জন্য শ্বশুর বাড়ীতে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়, কোথাও বা শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়েও দেয়। এছাড়াও সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়, ফলে তাঁরা নিজের কাছে নিজে সবসময় ছোট হয়ে থাকেন। যদি তাঁরা অন্যের গর্ভ ভাড়া করে সন্তান নেন বা সন্তান দত্তক নেন তবে জীবনটা অনেকটা স্বাভাবিক হয়। তবে, অন্যের গর্ভভাড়া করে সন্তান না নিয়ে আত্মীয় বা অনাত্মীয় পছন্দসই কোন অসহায় শিশুকে সন্তান জ্ঞানে পালন করা বেশি ভাল। কারণ আজকাল অভাবের কারণে অনেকে গর্ভ ভাড়া দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু আপন সন্তানকে ৯ মাস ১০ দিন আপনার রক্ত থেকে আপন গর্ভে লালন করে, যখন সব অধিকার ছিন্ন করে অন্য কাউকে চিরদিনের মত দিয়ে দিতে হয়, তখন সেই মায়ের প্রাণেও অনেক ব্যথা লাগে। অন্যের দুঃখের বিনিময়ে নিজের যে আনন্দ সে আনন্দ তেমন গ্রহণীয় নয়। নানা কারণে সন্তানহীনতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে ফলে এই পেশায় অনেক নারীই আসছেন অভাবের তাড়নায়। তাঁদের প্রতি আমরা মেয়েরা যেন একটু সহানুভূতিশীল হই।

১০। কন্যাভ্রূণ হত্যা:
ভারতবর্ষে প্রতিবছর কুড়ি লক্ষ কন্যাভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে, প্রতিবছর মাতৃগর্ভেই মেরে ফেলা হয় ৪২ শতাংশ কন্যা সন্তানও ২৫ শতাংশ পুত্র সন্তান। অনেক মায়েরই ভ্রূণ হত্যা করার মত ইচ্ছা থাকে না তবুও পরিবারের চাপে পড়ে কিংবা প্রাণের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা করতে হয়। কারণ পরপর তিনটি কন্যা সন্তান প্রসব করলে পরিবার তাকে বাঁচিয়ে রাখতে না দিতে পারে, বাড়ির থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। একথা কোন কোন স্বামী বা শাশুড়ি আগেই বলে দেন। নারী জীবনের এ এক কঠিন পরিস্থিতি। নিজের আত্মজ যে পৃথিবীর আলো দেখবার জন্য গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে, তাকে বিনা অপরাধে মেরে ফেলতে হবে। এ ব্যাপারে পুরুষদের আরও মানবিক হওয়া দরকার, কারণ কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া তো কোন অপরাধ নয়। এতে সামাজিক সঙ্কটও দেখা দিচ্ছে, পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত কমছে।

১১। বৃদ্ধ নারীদের সমস্যা ঃ
কয়েকমাস আগে একটি জনপ্রিয় বাংলা সংবাদপত্রের হেড লাইন ছিল, 'মা নয়, ভিখিরি, কোর্টে দাবি ছেলের'। কোন কোন ছেলে এবং ছেলের স্ত্রী মাকে খেতে দিচ্ছেন না, মারধোর করছেন, কেউ আবার সম্পত্তির লোভে মাকে খুন করছেন, এমনটাও এই সমাজে ঘটছে। নিজের ছেলের কাছে থাকছেন আশ্রিতের মত। যে সব মহিলা বিধবা, বয়স্কা, তাঁদেরকে অনেক ছেলেই বাড়ীতে থাকতে দিচ্ছেন না। কেউ খাওয়া আলাদা করে দিচ্ছেন, কেউ বৃদ্ধাবাসে পাঠাচ্ছেন, কেউ বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে ঠিক নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন না, কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা একেবারে নিরুপায় তাঁরা অনেকে যান বৃন্দাবন বা বারাণসীতে। শুধু বৃন্দাবনেই বিধবাদের সংখ্যা কুড়ি হাজারেরও বেশি তার মধ্যে অন্ততঃ পনেরো হাজারই বাঙালি। সরকারী আবাসে প্রায় ৮০০ বৃদ্ধা থাকেন, বাকিরা বিভিন্ন আশ্রমে থাকেন, কেউ ঘর ভাড়া করে থাকেন আর অন্ততঃ হাজার চারেক বৃদ্ধার রাতে কোন আশ্রয় নেই। কেউ মন্দিরে ভিক্ষা করেন। কেউ বাসন মাজেন, কেউ ভগবান ভজনাশ্রমে ৬ ঘন্টা ভজন করার বিনিময়ে ১০ টাকা পান, সে সুযোগ মাত্র তেত্রিশশো মহিলার জন্য। ঐ সব অসহায় মহিলারা মারা গেলে সৎকারের সুবন্দোবস্ত নেই।

আশার কথা দেশের বিখ্যাত সুলভ শৌচাগার কর্মসূচীর প্রবক্তা ড. বিন্দেশ্বর পাঠকের প্রতিষ্ঠান সুলভ ইন্টারন্যাশানাল সোসাল অরগানাইজেশন সাম্প্রতিক বারাণসীর ২০০ জন বিধবাকে দত্তক নিয়েছে তাঁরা তাদের নির্দিষ্ট আশ্রমেই থাকবেন। সংস্থা থেকে তাঁদের মাসিক দু'হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। তাঁদের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হবে। যারা কমবয়সী শক্তসমর্থ তাদের হাতের কাজ শিখিয়ে কাজের সুযোগ করে দেবে। অসহায় নারীদের জন্য 'সুলভ ইন্টারন্যাশনাল' যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা যদি এই কাজটা তাঁদেরও কর্তব্য মনে করেন তাহলে কিছু মানুষ মানুষের সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে এবং মৃত্যু হলে সম্মানের সাথে সৎকার হতে পারে। আর যদি কোন বড় প্রতিষ্ঠান নিজেরাই বিনামূল্যে বৃদ্ধাবাস গড়ে তোলেন সেটা বৃদ্ধাদের জন্য আরও বেশি ফলপ্রসু হবে। কোন আশ্রমকে বৃদ্ধাদের জন্য টাকা দিলে সেই টাকা পুরোটা টাকাটা বৃদ্ধাদের পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

সবশেষে তাঁদের কথা বলি, নারীর মতই পোশাক পরেন, নারীর মতই সাজগোজ করেন কিন্তু নারীও নয় আবার পুরুষও নয়, দেখতেও নারী বা পুরুষ থেকে একটু আলাদা। প্রকৃতির নিয়মেই কিছু গঠনগত অস্বাভাবিকতার জন্য বড় দুর্বিষহ তাঁদের জীবন। ওঁদের আলাদা সমাজ আছে, বাঁচার কিছু নিয়ম কানুন আছে। ওঁদের দলের যিনি প্রধান তাঁর কথা মতই চলতে হয়। সমাজের মধ্যেই নপুংসকরা জন্মায়, বড় হয়ে ওঠে। তারপর বৃহন্নলারা জানতে পারলেই নিয়ে চলে যান তাঁদের সমাজে।তাঁদের আয়ের পদ্ধতিও সম্মানজনক নয়। পুরুষ নারী কেউই তাদের পছন্দ করে না। তাদের সংসার নেই, ভালোবাসার জন নেই, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করা খুবই কষ্টকর হয়। পরিস্থিতিই তাঁদেরকে রুক্ষ করে তোলে, দুর্মুখ করে তোলে, তাই কেউ দেখে মজা পায়, কেউ দেখে বিরক্ত হয়। প্রতিবন্ধী মানুষদের কল্যাণে তো অনেক বাবস্থাই সরকারী ও বেসরকারী স্তরে আছে; কিন্তু এই সব হতভাগ্য মানুষদের জন্য কোন ব্যবস্থা আছে বলে জানা নেই। ওঁদের অস্বাভাবিক জীবনের জন্য আমাদের যেন একটু সহানুভূতি থাকে!

আশা রাখব রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃদ্ধাবাস গড়বেন যাতে বিত্তবান প্রবীন ব্যাক্তিরা মূল্য দিয়ে এবং অসচ্ছল ব্যক্তিরা বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও সর্বোপরি সেবা-যত্নের সুযোগ পান।

পারি তিনি অসহায়, বিধবা বৃদ্ধাদের জন্য কিছু আবাস গড়ে দেবেন যাতে শেষের দিনগুলো খাওয়া-পড়ার জন্য দুর্ভাবনায় থাকতে না হয়, এবং মৃত্যুর পর যেন সম্মানজনক ভাবে সৎকার হয়। আর সেই সাথে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যদি বৃহন্নলাদের জন্য কিছু আবাস গড়ে তাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ করে দেন তাহলে তাঁরাও একটু 'মানুষ' পরিচয় নিয়ে বাঁচতে পারেন।